HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৭ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০০৯
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৭

২০০৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় রিকেট সমীক্ষা

পৃষ্ঠা ১১

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিস-এর আনুমানিক হার নির্ধারণের জন্য স্বল্পখরচের একটি নতুন পদ্ধতি

পৃষ্ঠা ১৮

সার্ভিলেন্স আপডেট

২০০৮ সালে বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাব

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বির একটি অনুসন্ধান দল রাজশাহী এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এই প্রথমবারের মতো সংঘটিত মশাবাহিত জ্বর চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করে। দলটি ৩৯ জন রোগী সনাক্ত করে যাদের কেউই মারা যায় নি। শতকরা ৭৪ ভাগ রোগী সংক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ করার এক থেকে দু'মাস পরেও হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যাথায় ভুগছে। মশা নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য বার্তার ব্যাপক প্রচার চিকুনগুনিয়া রোগের ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব রোধ করতে পারে। যেসব স্থানে রোগের প্রভাব বেশি সেসব স্থানে ত্বরিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সুবিধাসহ রোগের লক্ষণ সনাক্ত-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্স রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক হতে পারে।

চিকুনগুনিয়া মশাবাহিত ভাইরাস জ্বর যা চিকুনগুনিয়া নামক আলফা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে *এডিস এজিপটি* এবং *এডিস আলবোপিকটাস* মশককূল হচ্ছে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রধান বাহক (১)। চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের লক্ষণ হচ্ছে হঠাৎ জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে বিশেষ করে হাঁটু, কব্জি এবং হাত বা পায়ের আঙ্গুলের অস্থিতে ব্যাথা অনুভব করা। এই ব্যাথা মাঝে মাঝে শরীরের বড় বড় সংযোগস্থলেও হতে পারে। এছাড়া মাঝেমধ্যে হাড়ের সংযোগস্থল ফুলে যেতে

icddr,b

KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

পারে এবং ৪০-৫০% রোগীর চামড়ায় *ম্যাকুলপাপুলার* বা *পিটিশিয়ার* মতো দানা দেখা দিতে পারে (১)। পূর্ব-আফ্রিকান ভাষায় চিকুনগুনিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে বাকা হয়ে হাঁটা যা এই রোগে আক্রান্তদের হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথার (আর্থালজিয়া) তীব্রতাকে বোঝায় (১)। এই মারাত্মক আর্থালজিয়া বা হাড়ের ব্যাথার লক্ষণ চিকুনগুনিয়াকে ডেঙ্গু থেকে আলাদা করে থাকে, অন্যথায় এ দু'টি রোগেরই বাহক এবং লক্ষণ একই (১)। লক্ষণ দেখে চিকুনগুনিয়া জ্বরের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং হাড়ের সংযোগ স্থলের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য স্যালিসাইলেট নয় এমন ব্যথা উপশমকারী (নন-স্যালিসাইলেট অ্যানালজেসিকস) এবং স্টেরয়েডাল নয় এমন প্রদাহবিহীন (নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি) ওষুধ প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় (১)।

প্রথম চিকুনগুনিয়া মহামারী দেখা দেয় ১৯৫২ সালে তাঞ্জানিয়ায় এবং সেই থেকে বার্মা, থাইল্যান্ড, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম-আফ্রিকা এবং ফিলিপাইনে এর সংক্রমণ সনাক্ত করা হয়েছে (১)। ভারতে চিকুনগুনিয়ার প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ১৯৬৩ সালে কলকাতায়। এরপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সেদেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়। এরপর ২০০৫-২০০৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্নাটকের কিছু জেলায় অনেক রোগীর সন্ধান পাওয়ার আগ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে ভারতে চিকুনগুনিয়ার পুনরুত্থান লক্ষ করা যায় নি (২)। ২০০৬ সালে ভারতে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার ফলে ঢাকায় দু'টি ভিন্ন সার্ভিলেন্স প্রকল্পের আওতাধীন জ্বরজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন ১৭৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তবে সেগুলোর কোনোটিতেই চিকুনগুনিয়ার অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় নি (৩)।

রাজশাহী জেলার সিভিল সার্জন পবা উপজেলার একটি গ্রামের মানুষের মধ্যে জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথাজনিত একটি প্রাদুর্ভাবের বিবরণসহ কিছু রোগীর একটি তালিকা ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইইডিসিআর-এর পরিচালক বরাবর পাঠান। তিনি আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বির গবেষকদের সমন্বয়ে একটি যৌথ অনুসন্ধান দল গঠন করেন। দলটি রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ২০ ডিসেম্বর রাজশাহী গমন করে।

অনুসন্ধান দলটি রোগীদের অসুস্থতা শুরুর সময়, তাদের রোগের লক্ষণ, চিকিৎসার কথা এবং ভ্রমণ কাহিনী-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করার জন্য তালিকাভুক্ত রোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। দলটি এ-ধরনের আরো রোগীর সন্ধান লাভের জন্য তালিকাভুক্ত রোগীদের কাছ থেকে তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ এ-ধরনের লক্ষণজনিত কোনো অসুস্থতায় ভুগছে কিনা তা জানতে চায়। অনুসন্ধানকালীন সময়ে কেউ জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথাজনিত অসুস্থতায় ভুগছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য দলের সদস্যরা তালিকাভুক্ত রোগীর বাড়ির আশে-পাশের বাড়িগুলোতেও অনুসন্ধান করেন। তাঁরা রোগীদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং মাঠ পর্যায়ে তা সেন্ট্রিফিউজ করে বরফে আবৃত করে আইইডিসিআর-এ নিয়ে আসেন। একই খানায় একাধিক রোগী থাকলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে যেকোনো একজনের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

অনুসন্ধান দলটি ৩২ জন রোগী সনাক্ত করে, যারা রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের 'এ' ব্লকের বাসিন্দা ছিলো। ব্লক 'এ'তে ডাব্লিউএক্স নামের প্রথম যে রোগীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তিনি ছিলেন ৩৬ বছর বয়সী একজন মহিলা। ওই এলাকায় তিনিই প্রথম আক্রান্ত হন। তিনি জানান

যে, দুর্গা পূজা (বাঙ্গালী হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব যা ৯ অক্টোবর ২০০৮ পালন করা হয়) উপলক্ষে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বারোঘরিয়া গ্রামে ব্লক 'বি'তে অবস্থিত তাঁর বাবার বাড়ি বেড়াতে যান। সেখান থেকে আসার পর ১৪ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বাবার পরিবারের ৫ জন তখন জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যাথায় ভুগতেছিলো। ব্লক 'এ'-এর আরো একজন রোগী দুর্গা পূজার সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একই এলাকায় ভ্রমণ করেছিলো। জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথা নিয়ে সে ১৫ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে ফিরে আসে। পরবর্তীতে অক্টোবর এবং ডিসেম্বরে রোগটি বিক্ষিপ্তভাবে ব্লক 'এ'-র মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ১)।

চিত্র ১: অসুস্থতা শুরুর তারিখ অনুযায়ী রাজশাহী জেলার বসন্তপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া গ্রামের রোগী: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৮

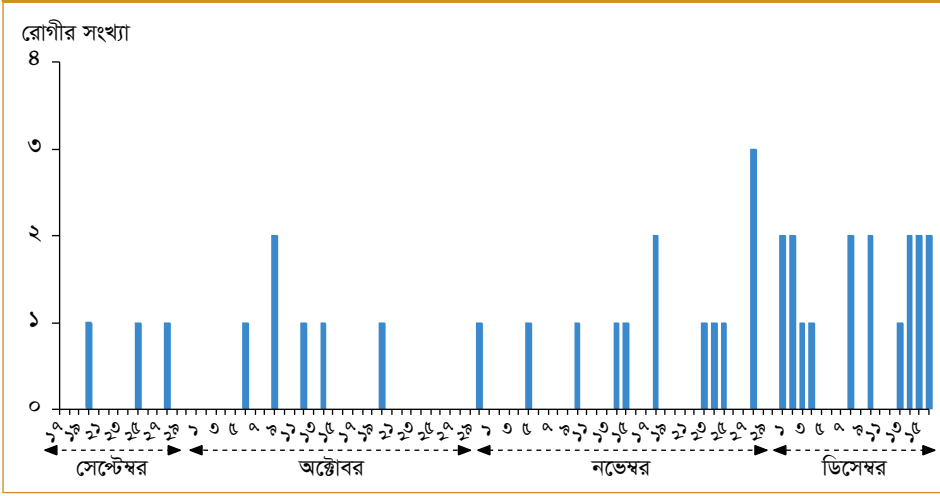

দলটি এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার বারোঘরিয়া গ্রামের ব্লক 'বি'-তে ডাব্লিউএক্স রোগীর বাবার বাড়ি পরিদর্শনে যায় এবং সেখানে ৭ জন রোগী সনাক্ত করে। ব্লক 'বি'-তে ওয়াইজেড রোগীর (ডাব্লিউএক্স রোগীর ভাই) কাছ থেকে জানা যায় যে, জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে তীব্র ব্যাথাসহ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে তিনিই ওই এলাকায় এ-রোগে প্রথম আক্রান্ত হন। তাঁর রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ২০ দিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, দু'সন্তান এবং ভাইও আক্রান্ত হয়। ওই এলাকায় কতগুলো খানা আক্রান্ত হয় তা যদিও দলটি জানতে পারে নি, তবে ওয়াইজেড রোগী তাঁদেরকে জানায় যে, তাঁদের এলাকার কিছু পরিবার একই ধরনের জ্বর ও হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছিলো। তবে অনুসন্ধানের সময় দলটি দু'টি জেলার কোথাও জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথাসহ কোনো রোগী খুঁজে পায় নি।

আক্রান্ত রোগীরা বেশিরভাগই ছিলো হিন্দু (৮৭%) এবং পেশায় কুমার (৬৪%)। তাদের গড় বয়স ছিলো ৩৪ বছর এবং ৪৯% (১৯/৩৯) ছিলো পুরুষ। রোগের শুরু ছিলো হঠাৎ করে। জ্বরের সাথে হাড়ের বিভিন্ন সংযোগস্থলে ব্যাথা ছিলো অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ। শরীর কাঁপিয়ে রোগীদের

জ্বর আসে এবং ৩৯ জন রোগীর মধ্যে ৭ (১৮%) জন জানায় যে, তাদের জ্বরের তাপমাত্রা ছিলো ১০৩-১০৪° ফারেনহাইট পর্যন্ত, যা তারা নিজেদের বাড়িতে মাপে। হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যাথা এত বেশি ছিলো বলে রোগীরা জানায় যে, তারা হাত দিয়ে কোনো কিছু তুলতে পারতো না এবং তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতো। উক্ত এলাকায় হাড়ের সংযোগস্থলের এই তীব্র ব্যাথা (আর্থালজিয়া) এবং জ্বর *ল্যাংড়া জ্বর* হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পায়। এই জ্বরের ফলে সাধারণত কব্জি, হাঁটু, পায়ের গোড়ালির সংযোগস্থল এবং হাত বা পায়ের আঙ্গুলের অস্থিতে ব্যাথা অনুভুত হয় এবং হাড়ের সংযোগস্থলগুলো ফুলে যায় (সারণি ১)। ৩৯ জন রোগীর মধ্যে ২৯ জন জানায় যে, জ্বর থেকে আরোগ্যলাভের এক থেকে দু'মাস পরেও তারা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথা অনুভব করে। আক্রান্ত রোগীদের কারোরই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার হয় নি। তারা সবাই অনানুষ্ঠানিক স্বাস্থ্য খাত থেকে চিকিৎসা নিয়েছে এবং ব্যথা উপশমকারী *(এনালজেসিক)* হিসেবে স্টেরয়েড এবং বহু ক্ষুদ্র জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর *(ব্রড স্পেকট্রাম)* জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে, যা দিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসকরা গ্রাম-গঞ্জে জ্বরজনিত অসুস্থতার চিকিৎসা করে থাকেন।

সারণি ১: রাজশাহী জেলার বসন্তপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া গ্রামের রোগীদের রোগসম্পর্কিত তথ্য

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সংখ্যা=৩৯ (%)
বয়স (বছর)	
গড়	৩৪
মিডিয়ান	৩৫
পুরুষ	১৯ (৪৯)
জ্বর	৩৯ (১০০)
হাঁড়ের সংযোগস্থলে ব্যাথা (সব ধরনের)	৩৯ (১০০)
মাংসপেশীর ব্যাথা	২৪ (৬২)
পিটিশিয়া এবং/অথবা ম্যাকালপপুলার দানা	১৫ (৩৯)
মুখে ঘাঁ	৩ (৮)

আক্রান্ত দু'টি জেলাই ভারতীয় সীমান্তের খুব কাছাকাছি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এবং পূর্বে বাংলাদেশের রাজশাহী এবং নওগাঁ জেলা। আক্রান্ত ৩৯ জন রোগীর মধ্যে যদিও ২ জন (৫%) ৫০ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত আক্রান্ত দু'টি জেলা পরিভ্রমণ করেন, তবে কেউই ভারতে ভ্রমণ করেন নি। তবে ওয়াইজেড রোগীর ৬০ বছর-বয়সী এক পুরুষ আত্মীয় এবং প্রতিবেশি ২০০৮-এর জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর প্রতিবেশি অন্য দু'জন লোকের সাথে ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেখানে যাওয়ার সময় বা ফিরে আসার পরে তাঁদের কারোরই অসুস্থ হওয়ার খবর জানা যায় নি।

আক্রান্ত দু'টি গ্রাম থেকে অনুসন্ধানকারী দলটি ১৭টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে। এর কোনোটিতেই ডেঙ্গুর অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় নি। লেপ্টোসপিরোসিস এবং চিকুনগুনিয়া সনাক্ত করার জন্য ডাব্লিউএক্স এবং ওয়াইজেড রোগীর নমুনাসহ ৪টি নমুনা আইইডিসিআর-এ পরীক্ষা করা হয়। এর কোনোটি থেকেই লেপ্টোসপিরোসিস সনাক্ত করা যায় নি, তবে ডাব্লিউএক্স এবং ওয়াইজেড রোগীর নমুনা থেকে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের অ্যান্টিবডি সনাক্ত করা হয়।

কীটতত্ত্ববিদদের একটি দল দু'টি প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকার লার্ভার ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। তাঁরা গবেষণাগারের পরীক্ষায় চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত নিশ্চিত ২ জন রোগীর বাড়ি এবং তাদের বাড়ির ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত অন্য ২২টি বাড়ি পরিদর্শণ করেন। কারণ *এডিস এজিপটি* মশা ১০০ মিটার এবং *এডিস অ্যালবোপিকটাস* মশা ৪০০-৬০০ মিটার এলাকার মধ্যে উড়ে বেড়ায় (১,৪)। তাঁরা যেসব বাড়ি পরিদর্শণ করেন সেসব বাড়ির ঘরের ভিতর এবং বাইরে রাখা পানির পাত্র

(সেখানকার কুমারদের তৈরি অগণিত মাটির পাত্রসহ) পরীক্ষা করে ৩৭১টি লার্ভা সংগ্রহ করেন। লার্ভাগুলো গ্লাসের তৈরি ছোট বোতলে করে আইইডিসিআর-এর গবেষণাগারে পাঠানো হয়, যেখানে সেগুলোকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত লার্ভা জন্মের বিষয়সম্বলিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সনাক্ত এবং গণনা করা হয় (৪)। সংগৃহীত লার্ভাগুলোর মধ্যে বেশিরভাই (৩৫১/৩৭১) (৯৫%) ছিলো *এ. অ্যালবোপিকটাস*-এর। কিছু (৫%) ছিলো *সিএক্স কুইনকুফ্যাসিয়াটাস* গোত্রের। যেসব পানির পাত্র পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে প্রতিটি *পিটুন*সহ (মাটির পাত্র তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত কাঠের যন্ত্র) ভিজা মাটির পাত্র, রং করা ভিজা মাটির পাত্র এবং কাদার পাত্রে *এ. অ্যালবোপিকটাস* মশার লার্ভা ছিলো।

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সংক্রামক রোগ ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মন্তব্য

আলোচ্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত রোগসম্পর্কিত তথ্য এবং রক্ত পরীক্ষার ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো বাংলাদেশে সংঘটিত প্রথম চিহ্নিত চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাব। লার্ভার ওপর পরিচালিত সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায় প্রভাব বিস্তারকারী মশা ছিলো *এ. অ্যালবোপিকটাস* গোত্রের, যা চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের একটি পরিচিত বাহক। বাংলাদেশে *এ. অ্যালবোপিকটাস* মশার ঘনত্বসম্পর্কিত তথ্য যদিও সীমিত, তবে ঢাকা শহরে একটি ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময় এ-প্রজাতির মশার উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে (৫)। আক্রান্ত রোগীদের বেশিরভাগই যেহেতু কুমার, সেহেতু তাদের বাড়ির মধ্যের ভিজা মাটি এবং কাদার পাত্রে *এ. অ্যালবোপিকটাস*-এর ঘনত্ব আলোচ্য প্রাদুর্ভাবকে ত্বরান্বিত করে থাকতে পারে।

পণ্য পরিবাহী কন্টেইনারে করে ব্যবহৃত-টায়ার পরিবহনের মাধ্যমে *এ. অ্যালবোপিকটাস* মশা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে (৬)। সংক্রামিত মশা ভারত থেকেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার ফলে দ্রুত এর বংশ বিস্তারও ঘটে থাকতে পারে। মানুষ একবার আক্রান্ত হলে তার শরীর চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের ধারক হিসেবে কাজ করতে পারে (১), যা আক্রান্ত দু'টি জেলার মধ্যে ভ্রমণকারী রোগীদের সংক্রমণ থেকে বোঝা যায়।

উচ্চ হারে চিকুনগুনিয়াকবলিত এলাকা পরিভ্রমণকারী পর্যটকদের মধ্যে চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণের খবর ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে (১)। লক্ষণবিহীন চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ খুবই কম এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশের অন্তর্বর্তীকাল (ইনকিউবেশন) ২-১২ দিন (৭)। অতএব ওয়াইজেড রোগীর যে প্রতিবেশী ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলো এবং যার মধ্যে চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ দেখা যায় নি, তার পক্ষে দু'মাসেরও বেশি পরে প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায় সংক্রমণ বয়ে আনার সম্ভাবনা ছিলো না (৭)।

অনুসন্ধানকারী দলের কাছে প্রাদুর্ভাব বিস্তারসম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য ছিলো না। প্রতিবেশি জেলাগুলোতেও এ-প্রাদুর্ভাব বিস্তার লাভ করে থাকতে পারে যে সম্পর্কে দলের সদস্যরা অবগত ছিলেন না। চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাব একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে আক্রান্ত করে থাকে বলে ইতোপূর্বে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় (১,২)। তবে প্রদুর্ভাবকবলিত এলাকার বাইরে আর কোনো রোগীর সন্ধান তাঁরা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অথবা ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন নি।

এই অনুসন্ধানে আরো একটি সীমাবদ্ধতা ছিলো এই যে, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সনাক্ত করার জন্য গবেষণাকারীরা মাত্র ৪টি নমুনা পরীক্ষা করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা আক্রান্ত রোগীদের সঠিক সংখ্যা জানেন না। এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, আক্রান্ত সব রোগীদের রোগের লক্ষণ যেহেতু একই রকম ছিলো, সেহেতু জ্ঞাত সব রোগীকেই গবেষণাগারে পরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো না (৮)।

চিকুনগুনিয়া রোগের প্রতিষেধক কোনো ভ্যাকসিন যেহেতু এখনো পাওয়া যায় না, সেহেতু এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মশার বংশ বিস্তার রোধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ (৬)। *এ. অ্যালবোপিকটাস* মশা খুব আক্রমণাত্মক, নীরব এবং দিন ও রাতের বেলায় কামড়ায়, তাই মশারী দিয়ে কার্যকরভাবে চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না (১)। বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ একটি কঠিন কাজ, এবং *এ. অ্যালবোপিকটাস* কীটনাশকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে (১)। যেহেতু ভবিষ্যতে প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু কোনো স্থানে কিছু মানুষের মধ্যে সংক্রমণ সনাক্ত করার সাথে সাথে ভাইরাসটির বাহক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে মহামারীর বিস্তার কমিয়ে আনা যেতে পারে। সম্ভাব্য বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস অথবা ঘন ঘন পরিষ্কার করে বা কীটনাশক দিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে (১)। এছাড়া জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে তীব্র ব্যাথাজনিত রোগী সনাক্ত করার জন্য গবেষণাগারে রোগ নির্ণয়ের (যেমন- ক্যাপচার এনজাইমগুলিংকড ইম্মিউনোঅ্যাসে (৩) দ্বারা ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ পরীক্ষা) ব্যবস্থাসহ রোগের লক্ষণসম্বলিত সার্ভিলেন্স কর্মসূচি সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে সজাগ রাখতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যৎ চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের নির্দেশক হিসেবেও তা কাজ করতে পারে। রোগের লক্ষণ এবং মানসম্মত চিকিৎসা-নির্দেশিকার ব্যাপক প্রচারও জীবাণুনাশক এবং স্টেরয়েড দিয়ে করা চিকুনগুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রতিরোধ করতে পারে।

References

1. Pialoux G, Gauzere BA, Jaureguiberry S, Strobel M. Chikungunya, an epidemic arbovirus. *Lancet Infect Dis* 2007;7:319-27.
2. Ravi V. Re-emergence of Chikungunya virus in India. *Indian J Med Microbiol* 2006; 24: 83-4.
3. ICDDR,B. No evidence of chikungunya virus in Dhaka, Bangladesh. *Health Sci Bull* 2007;1-4.
4. World Health Organization. Prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic fever: comprehensive guidelines. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia, 1999. 134 p.
5. Wagatsuma Y, Breiman RF, Hossain A, Rahman M. Dengue fever outbreak in a recreation club, Dhaka, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* 2004;10:747-50.
6. Reiter P, Fontenille D, Paupy C. Aedes albopictus as an epidemic vector of chikungunya virus: another emerging problem. *Lancet Infect Dis* 2006;6:463-4.
7. CDC. Chikungunya: Chikungunya Symptoms and Treatment. (http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/Chikungunya/CH-SymptomsTreatment.html, accessed on 28.01.2009)
8. Gregg MB. Conducting a field investigation. *In*; Gregg MB editor. Field Epidemiology, 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996. p. 62-78.

২০০৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় রিকেট সমীক্ষা

শিশুদের হাড় নরম হয়ে যাওয়াকে রিকেট বলে, যার ফলে হাড় বেঁকে যেতে পারে এবং স্থায়ীভাবে অঙ্গবিকৃতি হতে পারে। বাংলাদেশের ১-১৫ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে জাতীয়ভাবে রিকেটের হার নির্ধারণের জন্য এ-সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। দেশের ৬টি বিভাগের সবগুলো থেকে ২০,০০০ শিশুর উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এসব শিশুর মধ্যে ১৯৭ (০.৯৯%) জনের রিকেট ছিলো। এ-হার সবচেয়ে বেশি ছিলো ১-৫ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে। প্রত্যেক বিভাগের শিশুদের মধ্যেই রিকেট পাওয়া যায়, তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় চট্টগ্রাম বিভাগে। এক্স-রে পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, রিকেট আক্রান্ত ২৪% শিশু সরাসরি অসুস্থ ছিলো। ২০% রিকেট-আক্রান্ত শিশু ছিলো স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত (<৩,০০০ টাকা মাসিক আয়), এবং ৫৬% ছিলো মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত (৫,০০১-৮,০০০ টাকা মাসিক আয়)। সরাসরি রিকেটের লক্ষণজনিত শিশু অথবা রিকেটে আক্রান্ত হতে চলেছে এমন শিশুদের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা উচিত এবং মারাত্মক রোগীদেরকে পরীক্ষা করে সঠিকভাবে অস্ত্রপচার করা উচিত।

শিশুদের হাড় নরম হয়ে যাওয়াকে রিকেট বলে, যার ফলে হাড় বেঁকে যেতে পারে এবং স্থায়ীভাবে অঙ্গবিকৃতি হতে পারে। ধনুকের মতো বাঁকা পা এবং/অথবা হাঁটুর কাছ থেকে দু'পা দু'দিকে বেঁকে যাওয়া দেখে সহজেই রিকেট সনাক্ত করা যায়। ১৬০০ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে সর্বপ্রথম রিকেট সনাক্ত করার খবর পাওয়া যায় (১)। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় কর্মরত 'সোশাল এসিসট্যান্স অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল (শারীরিকভাকে ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদেরকে সামাজিক সহযোগিতা এবং পুনর্বাসন) বা সংক্ষেপে 'এসএআরপিভি' নামক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সর্বপ্রথম রিকেট সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে।

১৯৯৮ সালে ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড অ্যান্ড মাদার হেলথ চট্টগ্রাম বিভাগে একটি ব্যাপক সমীক্ষা চালায় এবং ৮.৭% শিশুর মধ্যে কমপক্ষে একটি রিকেটের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে। এদের মধ্যে ৪%-এর শরীরের নিচের অংশ বিকলাঙ্গ ছিলো, ০.৯%-এর এক্স-রেতে রিকেটের লক্ষণ দেখা গেছে এবং ২.২%-এর রক্তের অ্যালকালিন ফসফেটেজ বেশি ছিলো (২)। ব্রাক ২০০৩ সালে চট্টগ্রামে ১-২০ বছর-বয়সীদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায় এবং ০.৯% রিকেটজনিত বিকলাঙ্গ মানুষ সনাক্ত করে (৩)। ২০০০ এবং ২০০৪ সালে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল (এইচকেআই) বাংলাদেশের ২৮টি উপজেলায় সমীক্ষা চালায়। ২০০০ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় ২১,৫৭১ জন শিশুর মধ্যে ০.২৬%, এবং ২০০৪ সালের সমীক্ষায় ১০,০০৫ জনের মধ্যে ০.১২% রিকেটজনিত বিকলাঙ্গ পাওয়া যায়। এসব উপজেলার অর্ধেকেরও বেশিতে রিকেট সনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সিলেটের উত্তর-পূর্ব এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায়। রিকেটজনিত স্পষ্ট বিকলাঙ্গতা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে (১.৪%) কক্সবাজার উপজেলায় ১-১৫ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে (৪)।

খাদ্যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন 'ডি' উভয়ের ঘাটতির ফলে রিকেট হতে পারে। বাংলাদেশের ইতোপূর্বেকার গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি রিকেটের একটি বড় কারণ নয়, বরং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিকে রোগের প্রাথমিক কারণ হিসেবে মনে করা হয় (৫)।

বাংলাদেশের ১-১৫ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে জাতীয়ভাবে রিকেটের হার নির্ধারণ এবং তাদের খাদ্যের পুষ্টিমাত্রা ও খাদ্যের ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের সাথে এর সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করার জন্য এ-সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের সবক'টি থেকে গ্রামাঞ্চলের ১৬,০০০ এবং শহুরে বস্তি পরিবারের ৪,০০০ নিয়ে মোট ২০,০০০ শিশুকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়। ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রামাঞ্চল থেকে ৩৮৪টি এলাকা/গ্রাম বাছাই করা হয় এবং প্রত্যেকটি এলাকা/গ্রাম থেকে ৪২ জন করে শিশু পদ্ধতিগতভাবে বাছাই করে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। শহুরে শিশু বাছাই করার জন্য ৬টি শহর থেকে ৫০টি ওয়ার্ড দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়। একটি ওয়ার্ডের বস্তির তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৪টি বস্তি বাছাই করা হয় এবং প্রত্যেক বস্তি থেকে ২০ জন করে শিশু সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই করা হয়। তালিকাভুক্তির পর তারা রিকেটে আক্রান্ত কি না তা পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের বর্তমান এবং অতীত খাদ্য অভ্যাস সম্পর্কে জানার জন্য তাদের মা-বাবা বা অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। জনমিতিসংক্রান্ত পরিমাপ ব্যবস্থা (ওজন, উচ্চতা, ঊর্ধ্ব-বাহুর মাঝখানের পরিধি) এবং নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংখ্যা ও গুণগত উভয় প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সন্দেহজনক রোগীদের এক্স-রে থেকে রিকেটের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য তাদের এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়েছে। রিকেটের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো হলো – পাঁজরে গুটিকা, হাতের কব্জি মোটা, হাঁটার সময় পায়ে ব্যাথা, বাঁকা হাঁটু ও পা, দু'পা একদিকে হাঁটু থেকে বাঁকা, এবং হাঁটুর নিচ থেকে সামনের দিকে বাঁকা পা। পাঁচ বছরের কম-বয়সী কোনো শিশুর মধ্যে যদি উপরোক্ত লক্ষণসমূহের যেকোনো ৩টি এবং ৫ বছরের বেশি-বয়সীদের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি লক্ষণ স্পষ্ট থ াকে তাহলে তা রিকেট হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রিকেট সনাক্তকরণের নির্দেশিকা হিসেবে গবেষণা-কর্মীগণ রিকেট-আক্রান্ত রোগীর ছবিসম্বলিত রঙ্গীন পোস্টার ব্যবহার করেছেন। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মাঠকর্মীরা গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করেন। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য মাঠকর্মীরা ৬টি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে ২ জন করে এবং সাধারণ শিশুদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে ২ জন করে অভিভাবক বাছাই করেন।

এক থেকে ১৫ বছর-বয়সী ২০,০০০ শিশুর মধ্যে ১৯৭ জনের (০.৯৯%) রিকেট ছিলো। এদের মধ্যে ৬২%-এর বয়স ছিলো ৫ বছরের নিচে, ২৬% ছিলো ৬-১০ এবং ১২% ছিলো ১১-১৫ বছর-বয়সী। শতকরা ৬১ জন ছিলো পুরুষ। রিকেটের হার সবচেয়ে বেশি ছিলো চট্টগ্রাম বিভাগে (২.১৯%), এবং অন্য কোনো বিভাগে এ-হার ০.৩%-এর বেশি ছিলো না (সারণি ১)। গ্রাম এবং শহর উভয় অঞ্চলেই রিকেট রোগী ছিলো (গ্রামে ১.১% এবং শহরে ০.৮%)।

রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৩৭%-এর ৩টি, ৩৮%-এর ৪টি এবং ১১%-এর ৫টি করে রোগের লক্ষণ ছিলো (সারণি ২)। একশ ছাপ্পান্ন জন রিকেট-আক্রান্ত শিশুর হাতের কব্জি এবং হাঁটুর সংযোগস্থলের এক্স-রে করা হয়। এক্স-রে পরীক্ষার ফলাফলসমূহ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং দেখা যায় যে, ২৪% শিশু সরাসরি রিকেট-আক্রান্ত ছিলো, ৩৫% রিকেট-আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং ৪১%-এর মধ্যে রিকেটের কোনো লক্ষণ ছিলো না।

কক্সবাজার জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবারে একাধিক রিকেট রোগী ছিলো। নির্বাচিত জেলাসমূহের মধ্যে চট্টগ্রামের দক্ষিণে রিকেটের হার ছিলো সবচেয়ে বেশি।

একজন রিকেট রোগী আছে এমন খানাসমূহের মাসিক আয়ের মধ্যমা ছিলো ৫,০০০-৮,০০০ টাকা (৭৫-১২০ মার্কিন ডলার) এবং ২০%-এর মাসিক আয় ছিলো ৩,০০০ টাকার নিচে (৪৫ মার্কিন ডলার)।

রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের গড় বয়স ছিলো ৫.৬ বছর এবং গড় ওজন ছিলো ১৩.৯ কিলোগ্রাম। এক থেকে ১৫ বছর-বয়সী যে ১৫৪ জন শিশুর উচ্চতা, ওজন এবং উর্ধ্ব-বাহুর পরিধি পরিমাপ করা হয়, তাদের ৫৩% ছিলো অতি খর্বকায় এবং ২২% ছিলো মাঝারি ধরনের খর্বকায়। রিকেট-আক্রান্ত ৭০% শিশুর ওজন স্বাভাবিক থেকে কম এবং ৪০%-এর ওজন ছিলো খুবই কম। শতকরা ১৭ ভাগ রিকেট-আক্রান্ত শিশু ছিলো ক্ষীণকায় (উচ্চতার তুলনায় ওজন ছিলো স্বাভাবিক থেকে ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিচে)।

সারণি ১: বিভাগওয়ারী রিকেট-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা

বিভাগ	মোট (সংখ্যা)	রিকেট-আক্রান্ত শিশু (সংখ্যা)	শতকরা হার
বরিশাল	৪,৪৪৯	৭	০.১৬
চট্টগ্রাম	৬,৮৮৪	১৫১	২.১৯
ঢাকা	১২,০৭০	১৪	০.১২
খুলনা	৬,৭৬৪	৫	০.০৭
রাজশাহী	১২,৮১৩	৯	০.০৭
সিলেট	৩,৯১২	১১	০.২৮

সারণি ২: রোগের লক্ষণ অনুযায়ী রিকেট-আক্রান্ত বালক ও বালিকাদের সংখ্যা

রোগের লক্ষণ	বালক		বালিকা		মোট	
	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
তিনটির কম	৭	৫.৮	৮	১০.৪	১৫	৭.৬
৩টি	৪৮	৪০.০	২৫	৩২.৫	৭৩	৩৭.১
৪টি	৪৪	৩৬.৭	৩২	৪১.৫	৭৬	৩৮.৫
৫টি	১৫	১২.৫	৭	৯.১	২২	১১.২
৬টি	৬	৫.০	৫	৬.৫	১১	৫.৬
রিকেটিক শিশু	১২০	১০০.০	৭৭	১০০.০	১৯৭	১০০.০

জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিকেট-আক্রান্ত ৭৬% শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া হয়েছে। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে ৭% মা তার শিশুকে বুকের দুধ দিয়েছেন। মোটের ওপর ৭৫% রিকেট-আক্রান্ত শিশুকে কলোস্ট্রাম খাওয়ানো হয়েছে। শতকরা ৬২ জন মা জানতেন যে, কলোস্ট্রাম খাওয়ালে শিশুর উপকার হবে।

রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের মা-বাবার মধ্যে ১৪% ছিলেন রক্তসম্পর্কীয়। শতকরা ৩৫ জন মা জানিয়েছেন যে, তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যেও রিকেট রোগী আছে। রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের বেশিরভাগের মা কোন খাবারে ক্যালসিয়াম আছে তা জানতেন না।

গত এক বছরে এসব শিশুর ৯৭% জ্বরে, ৬৭% ডায়রিয়ায় এবং ৫২% আমাশয়ে ভুগেছে। এসব শিশুর মায়েদের কাছ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা চলাকালীন সময়ের পূর্বের এক বছরে এদের ১৪% নিউমোনিয়ায় ভুগেছে।

চিত্র ১-এ ২৪ ঘণ্টায় শিশুদেরকে ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ কোন খাদ্য কতজনকে কতবার দেওয়া হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। শতকরা ২৮ জন রিকেট-আক্রান্ত শিশু দিনে অন্তত একবার এবং ৩০% শিশু একাধিকবার শাক খেয়েছে। তাদের প্রায় অর্ধেক দিনে একাধিকবার এবং মাত্র ১৩% একবার ছোট মাছ খেয়েছে। দুধ পান করেছে খুবই কমসংখ্যক শিশু। মাত্র ৯% শিশু দিনে একবার এবং ৫% একাধিকবার দুধ পান করেছে।

নিবিড় গুণগত গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, রিকেট-আক্রান্ত অধিকাংশ শিশুর মায়ের রিকেট সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। তাঁদের একজন বলেন, "এটি আমার জন্য নতুন। শিশুটি হেলে-দুলে হাঁটে। ডাক্তারই ভালো বলতে পারবেন"। তিনি এটি লক্ষ করেছিলেন যে, শিশুটি যখন হাঁটা শিখে তখন তার পা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতো। বেশিরভাগ রিকেট-আক্রান্ত শিশুর মায়ের ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। অন্যদিকে রিকেট-আক্রান্ত নয় এমন শিশুদের মায়ের ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিলো। তাঁরা বলেছেন যে, দুধ, ডিম, শাক এবং ফলের মধ্যে ক্যালসিয়াম আছে।

চিত্র ১: ২৪ ঘণ্টায় শিশুদেরকে দেওয়া খাদ্য তালিকা, শিশুদের সংখ্যা এবং খাদ্য গ্রহণ

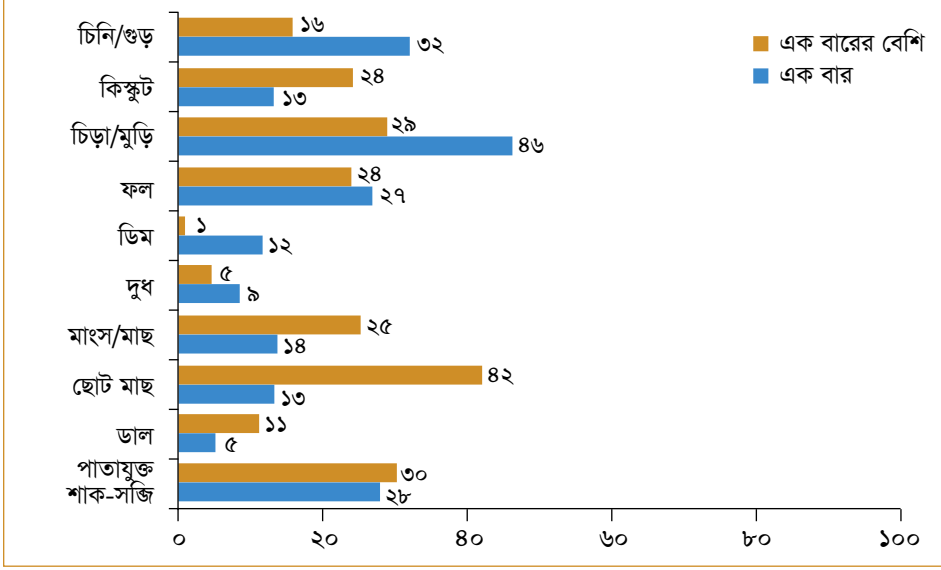

প্রতিবেদন: নিউট্রিশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (এনডব্লিউই) এবং রিকেটস ইন্টারেস্ট গ্রুপ (আরআইপি)

অর্থানুকুল্য: কেয়ার বাংলাদেশ; ইউনিসেফ; জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক)

মন্তব্য

জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী এই সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে এটি অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে ১-১৫ বছর-বয়সী প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু রিকেটে আক্রান্ত। রিকেট-আক্রান্ত অনেক শিশুর চলাফেরার ক্ষমতা ক্রমশ কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। এবং এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের, পরিবারের এবং জাতির বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের পরিবেশ, অসুখ-বিসুখ ও পুষ্টিহীনতা এই রিকেটের জন্য কতখানি দায়ী তা পুরোপুরি জানা যায় নি। এটি ভবিষ্যৎ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রিকেটজনিত সমস্যা কমিয়ে আনা এবং আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আরো দ্রুত করার ক্ষেত্রে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। রিকেট প্রতিরোধ এবং পূর্বাহ্নে এটি নির্ণয়ের জন্য প্রতিকার কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত মেডিকেল অফিসার এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির অধীনে কর্মরত কমিউনিটি পুষ্টি আপারা শিশুদের জন্য ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য এবং শিশুর জন্মের পর বুকের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে রিকেট প্রতিরোধ করতে পারেন।

সরাসরি রিকেটের লক্ষণজনিত শিশু অথবা রিকেটে আক্রান্ত হতে চলেছে এমন শিশুদের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা উচিত এবং মারাত্মক রোগীদেরকে পরীক্ষা করে সঠিকভাবে অস্ত্রপচার করা উচিত।

Reference

1. Rajakumar K. Vitamin D, cod-liver oil, sunlight, and rickets: a historical perspective. *Pediatrics* 2003;112:e132-5.
2. Fischer PR, Rahman A, Cimma JP, Kyaw-Myint TO, Kabir AR, Talukder K *et al*. Nutritional rickets without vitamin D deficiency in Bangladesh. *J Trop Pediatr* 1999 ;45:291-3.
3. Kabir ML, Rahman M, Talukder K, Rahman A, Hossain Q, Mostafa G *et al*. Rickets among children of a coastal area of Bangladesh. *Mymensingh Med J* 2004;13:53-8.
4. Helen Keller International. Prevalence of lower limb rickets Bangladeshi children in 2004: a follow-up to the 2000 survey. Nutritional Surveillance Project, January 2006.
5. Karim F, Chowdhury AM, Gani MS. Rapid assessment of the prevalence of lower limb clinical rickets in Bangladesh, *Public Health* 2003;117:135-44.

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিস-এর আনুমানিক হার নির্ধারণের জন্য স্বল্পখরচের একটি নতুন পদ্ধতি

মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত (মেনিনগো-এনসেফালাইটিস) অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্য থেকে জাপানিজ এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দু'টি সার্ভিলেন্স প্রকল্প পরিচালিত হয়। হাসপাতাল-সার্ভিলেন্সে রোগের হার যেহেতু প্রকৃত হার থেকে কম নির্ণীত হতে পারে, তাই স্বল্পখরচে একটি অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের এলাকায় (ক্যাচমেন্ট এলাকা) জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের জনসংখ্যাভিত্তিক আনুমানিক হার নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাপ্ত ওই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগীদের অনুপাত দ্বারা হাসপাতালভিত্তিক জাপানিজ এনসেফালাইটিসের হারকে ভাগ করে এই হিসাব করা হয়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপের মাধ্যমে সাধারণত কম হয় এমন একটি রোগের হার নির্ধারণ করা যেহেতু একটি ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার,

তাই এলাকায় মারাত্মক অসুস্থতা সম্পর্কে প্রতিবেশীদের সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত রোগীর সন্ধান করা হয়। ক্যাচমেন্ট এলাকায় মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত যেসব রোগী ছিলো তাদের মধ্য থেকে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো তাদের অনুপাত ছিলো ০.১১ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল, ০.০৬-০.১৬)। অনুসন্ধানকারীদের হিসাব অনুযায়ী ক্যাচমেন্ট এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিসের হার ছিলো প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ৩ জন (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল, ২.০-৫.৫), যা জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন প্রয়োগকারী অন্যান্য দেশের হারের মতো একইরকম। জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন যেহেতু কম দামে পাওয়া যায়, সেহেতু বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে এ-রোগের হার বেশি সেসব অঞ্চলে উক্ত ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভাইরাস একটি ফ্লেভিভাইরাস সংক্রমণ যা প্রধানত মশা-দ্বারা সংক্রামিত হয় (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিউলেক্স প্রজাতির মশার দ্বারা), এবং এটি এশিয়া মহাদেশে ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের প্রধান কারণ (১)। এ-রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি (১০-৩০%) এবং বেঁচে যাওয়া ৩০-৫০% রোগী দীর্ঘকালীন স্নায়ুতান্ত্রিক জটিলতায় ভোগে (২)। জাপানিজ এনসেফালাইটিস মশার মাধ্যমে পশুর মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং প্রধানত শুকরের মধ্যে, যেখানে মানুষ দুর্ঘটনাজনিতভাবে মাঝে-মধ্যে আক্রান্ত হয় (২,৩)। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে ৩টি জাপানিজ এনসেফালাইটিস প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। একটি ১৯৭৭ সালে সংঘটিত প্রথম জাপানিজ এনসেফালাইটিস প্রাদুর্ভাবের প্রমাণাদি সংরক্ষণ করে (৪), এবং বাকি দু'টি জাপানিজ এনসেফালাইটিস নির্ণয়ের জন্য পরিচালিত হাসপাতালভিত্তিক সার্ভিলেন্স গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে। হাসপাতালভিত্তিক প্রথম সার্ভিলেন্স প্রকল্পটি ২০০৩ সালের জুন থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে চারটি রেফারেল পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত যাদের স্নায়ুরসে রক্তের শ্বেতকণিকার পরিমাণ ৪-এর বেশি, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ৪র্থ রোগীকে নির্দিষ্ট আইজিএম অ্যান্টিবডি দ্বারা পরীক্ষা করা হয় জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগী সনাক্ত করার জন্য। মোট ৪৯২ জন রোগী পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের ৪%-এর (২০/৪৯২) মধ্যে জাপানিজ এনসেফালাইটিস পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে এ-রোগের সংক্রমণ পাওয়া যায় তাদের ৫৫%-কে (১১/২০) সনাক্ত করা হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ৩টি রেফারেল পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে দ্বিতীয় সার্ভিলেন্সটি পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগী সনাক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট আইজিএম অ্যান্টিবডি (জাপানিজ এনসেফালাইটিসের জন্য নির্ধারিত) দ্বারা মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণজনিত প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০০৭ থেকে মধ্য-আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণসম্বলিত মোট ৬৩২ জন রোগী পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের ৬%-এর (৩৬/৬৩২) মধ্যে জাপানিজ এনসেফালাইটিস পাওয়া যায়। এদের ৬৪%কে (২৩/৩৬) সনাক্ত করা হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে।

কমদামে জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন পাওয়া যায় এবং এ-রোগের প্রাদুর্ভাবকবলিত অনেক দেশে এটি এখন ব্যবহার করা হচ্ছে (৫)। বাংলাদেশের মত স্বল্পআয়বিশিষ্ট দেশে জীবন রক্ষাকারী একটি ভ্যাকসিন চালু করার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে রোগ প্রতিরোধে সাশ্রয়ী খরচের ওপর, যা মূলত

নির্ভর করে ওই রোগের প্রকোপের ওপর। শুধুমাত্র সার্ভিলেন্স হাসপাতালে আগত রোগীদের মধ্য থেকে জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের প্রকোপ হিসাব করলে এ-রোগের সত্যিকার সমস্যাকে খাটো করে দেখা হতে পারে, কারণ সব অসুস্থ ব্যক্তি ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে নাও আসতে পারে। জনসংখ্যাভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে সাধারণত কম হয় এমন রোগের হার নির্ধারণ করা একটি ব্যয়-সাপেক্ষ কাজ। আইসিডিডিআর,বি তাই স্বল্পখরচে একটি অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের প্রকোপ নির্ধারণের চেষ্টা করে, যেখান থেকে ইতোপূর্বে বেশিরভাগ জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগী সনাক্ত করা হয়। ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে গবেষণা-হাসপাতালে বিগত এক বছরে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্য থেকে গবেষণাগারের পরীক্ষায় নিশ্চিত জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগীর সংখ্যাকে হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকার মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে হাসপাতালভিত্তিক জাপানিজ এনসেফালাইটিসের হার গণনা করা হয়। হাসপাতালভিত্তিক হারকে ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাপ্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগী এবং ওই এলাকার মোট মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর অনুপাত দ্বারা ভাগ করে জনসংখ্যাভিত্তিক জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের প্রকোপ নির্ধারণ করা হয়।

নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী এই ৩টি জেলাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, কারণ নভেম্বর ২০০৭ থেকে এপ্রিল ২০০৮ সময়ে এ-হাসপাতালে ভর্তি মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত ৫৮% রোগীই ছিলো ওই জেলাগুলো থেকে আগত। বিগত এক বছরে ক্যাচমেন্ট জেলাসমূহে মস্তিষ্ক প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের সনাক্ত করার জন্য প্রথমে ২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয় (জনসংখ্যার আকৃতি অনুপাতে নির্বাচনের সম্ভাবনার সূত্র ব্যাবহার করে)।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করার গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করার জন্য গ্রামের মানুষের মধ্যেকার নিবিড় সামাজিক যোগাযোগের সুবিধাকে কাজে লাগানো হয়, কারণ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ এলাকার বিভিন্ন ঘটনা, যেমন - পরিবারের অসুস্থতা নিয়ে একে অপরের সাথে আলাপ করে থাকে এবং ফলে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত মারাত্মক কোনো ঘটনা কোনো পরিবারে ঘটে থাকলে তা প্রতিবেশিরা জেনে যায়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ, স্থানীয় বাজারের লোকজন এবং সুবিধাজনক নমুনা হিসেবে কিছু বাড়ির মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণসমূহ স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করার পর আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, তারা তাদের এলাকায় এমন কারো সম্পর্কে জানে কি না যে গত এক বছরে জ্বরে ভুগেছে এবং সেই সাথে দ্বিধান্বিত অথবা চৈতন্যহীন হয়ে পড়তো, অথবা নতুন করে খিঁচুনীতে আক্রান্ত হয়েছিলো। অনুসন্ধানকারী দলটি বিগত এক বছরের মধ্যে সন্দেহভাজন মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত কোনো রোগী অথবা কোনো মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলে সন্দেহভাজন ওই রোগীর খানা পরিদর্শন করে তার অসুস্থতাজনিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছে এবং সেই সাথে তার জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য, স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া-সংক্রান্ত আচরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য নিয়েছে। ক্যাচমেন্ট এলাকায় মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্তের হার হিসাব করার জন্য তাঁরা নিম্নলিখিতভাবে এ-রোগের সংজ্ঞা

দিয়েছেন: গত এক বছরের মধ্যে কারো নতুন করে খিঁচুনি (শরীর ঝাঁকানো) হলে অথবা কমপক্ষে একঘণ্টা ধরে অচেতন থাকলে, অথবা কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা ধরে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেলে তাকে মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। যেদিন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তার পূর্বের দু'বছরে ৬ মাসের মধ্যে যারা একাধিকবার খিঁচুনীতে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে গবেষণা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ এপিলেপসির মতো যাদের ক্রনিক খিঁচুনি আছে তাদেরকে গবেষণা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া ছিলো।

সার্ভিলেন্স হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকায় ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিলো ৪৩৮,০০০। সেখান থেকে ২৬৭ জন সন্দেহভাজন মস্তিষ্কের প্রদাহে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয় (প্রতি ১০০,০০০ জনে ৬১ জন)। মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত সন্দেভাজন রোগীদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৩%) ছিলো <৫ বছরের শিশু (সারণি ১)। অসুস্থতার সময় সন্দেহভাজন রোগীদের ৯৩%-এর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, ৭৯%-এর অচেতনতা, ৮৫%-এর নতুন করে খিঁচুনী, এবং ১৬%-এর ঘাড় শক্ত ছিলো বলে জানা যায় (সারণি ২)। সার্ভিলেন্স হাসপাতালে ভর্তি বেশিরভাগ (৭৬%) রোগীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ৬ মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো, যেখানে সার্ভিলেন্স হাসপাতালে ভর্তি না হওয়া বেশিরভাগ রোগীর (৬৭%) এ-অবস্থা ৬ মাসের কম-সময় ধরে স্থায়ী ছিলো (কাই-স্কয়ার পি <০.০০১) (সারণি ২)।

সারণি ১: মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য	গবেষণা হাসপাতালে ভর্তি (সংখ্যা = ২৯) %	গবেষণা হাসপাতালে ভর্তি হয় নি (সংখ্যা = ২৩৮) %	মোট রোগী (সংখ্যা = ২৬৭) %
লিঙ্গ			
পুরুষ	৬৬	৬২	৬৩
মহিলা	৩৫	৩৮	৩৮
বয়সভিত্তিক বিন্যাস			
এক বছরের কম	৩	৩	৩
১-৫ বছর	৩৫	৫২	৫০
৬-১৫ বছর	২১	২০	২০
১৬-৪৫ বছর	২৪	২০	২০
৪৫ বছরের বেশি	১৭	৭	৮

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সন্দেহভাজন মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়। দু'শ একত্রিশ (৮৭%) জন রোগী পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে, ৯ (৩%) জনকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ও অসুস্থ দেখা গেছে, ৮ (৩%) জন আংশিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে বলে তারা নিজেরা জানিয়েছে, এবং মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর ১৯ (৭%) জন মারা গেছে (সারণি ২)। রোগীদের অসুস্থতার মধ্যমা কাল ছিলো ৪ দিন।

সারণি ২: মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের রোগের লক্ষণসমূহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকালীন অবস্থা

লক্ষণ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকালীন অবস্থা	গবেষণা হাসপাতালে ভর্তি (সংখ্যা = ২৯) %	গবেষণা হাসপাতালে ভর্তি হয় নি (সংখ্যা = ২৩৮) %	মোট রোগী (সংখ্যা = ২৬৭) %
রোগের লক্ষণসমূহ			
মানসিক অবস্থার পরিবর্তন	৯৩	৯৩	৯৩
৬ ঘণ্টার কম	১৭	৬৭	৬১
৬ ঘণ্টার বেশি	৭৬	২৬	৩২
অচেতনতা	৬২	৮১	৭৯
৬ ঘণ্টার কম	২৪	৭৩	৬৭
৬ ঘণ্টার বেশি	৩৮	৮	১২
নতুন করে খিঁচুনী	৮৩	৮৫	৮৫
ঘাড় শক্ত	২৪	১৫	১৬
রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালীন অবস্থা			
সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ	৬২	৯০	৮৭
এখনো অসুস্থ	০	৪	৩
শারীরিকভাবে আংশিক অক্ষম	৩	৩	৩
মৃত	৩৫	৪	৭

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মারা যাওয়ার হার যারা ভর্তি হয় নি তাদের থেকে বেশি ছিলো (৩৫% বনাম ৪%ঃ কাই-স্কয়ার পি ভ্যালু <০.০০১)। মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত সন্দেহভাজন রোগীদের প্রায় সবাই (৯৮%) তাদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসালাভ করেছে, তবে মাত্র ১১% রোগী গবেষণা হাসপাতালে (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) চিকিৎসার জন্য এসেছে (সারণি ৩)। প্রিন্সিপাল কম্পনেন্টে এনালাইসিসের মাধ্যমে একটি সম্পদসূচি তৈরি করা হয়, তবে রোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসার কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সারণি ৩: মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা অনুসন্ধান-সংক্রান্ত আচরণ

স্বাস্থ্যসেবা অনুসন্ধান	পুরুষ (সংখ্যা = ১৬৭) %	মহিলা (সংখ্যা = ১০০) %	মোট (সংখ্যা = ২৬৭) %
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	১১	১০	১১
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক	২৮	৩৫	৩১
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন চিকিৎসক	৮৩	৮৫	৮৪

নিচের সূত্র অনুযায়ী হাসপাতাল-ভিত্তিক জাপানি এনসেফালাইটিসের হারকে ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাপ্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগী এবং ওই এলাকার মোট মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর অনুপাত দ্বারা ভাগ করে ক্যাচমেন্ট এলাকার জাপানিজ

এনসেফালাইটিস রোগের হার নির্ধারণ করা হয়:

$$\frac{\text{সার্ভিলেন্স হাসপাতাল থেকে সনাক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগী}}{\text{হাসপাতাল ক্যাচমেন্ট এলাকার জনসংখ্যা *পি* সার্ভিলেন্সের সময়কাল}}$$

পি = ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাপ্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগী এবং ওই এলাকার মোট মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর অনুপাত

অক্টোবর ২০০৭ থেকে আগস্ট ২০০৮ সময়ের মধ্যে ৬১ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত (২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) তিনটি ক্যাচমেন্ট জেলা থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্য থেকে ১৭ জন জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগী সনাক্ত করা হয়। হাসপাতাল ক্যাচমেন্ট এলাকার সমীক্ষায় সনাক্তকৃত ২৬৭ জন মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ২৯ জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলো। বিভিন্ন ক্লাস্টারের প্রভাব সমন্বয় সাধনের জন্য লিনিয়ার মিক্সড ইফেক্ট মডেল ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতাল ক্যাচমেন্ট এলাকায় মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণসম্বলিত যেসব রোগী ছিলো তাদের মধ্য থেকে গবেষণা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের অনুপাত (০.১১) বের করা হয় (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল, ০.০৬-০.১৬)। এ উপাত্ত ব্যবহার করে অনুসন্ধানকারীরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাচমেন্ট এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের যে হার নির্ধারণ করেন তা ছিলো প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৩ জন (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল, ২.০-৫.৫ প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যায়)।

প্রতিবেদন: সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি, স্বাস্থ্য পদ্ধতি ও সংক্রামক ব্যাধি বিভাগ, আইসিডিডিআর,বি; রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়

মন্তব্য

মস্তিষ্কের প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের ওপর পরিচালিত হাসপাতালভিত্তিক সাম্প্রতিক সার্ভিলেন্স থেকে জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, মস্তিষ্ক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীরা সচরাচর হাসপাতালে ভর্তি হয় জাপানিজ এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে। এ-গবেষণার গবেষণাকারীরাও বিশ্বাস করেন যে, জাপানিজ এনসেফালাইস রোগের প্রকোপ অনেক বেশি এবং তাই এই রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁরা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। রোগের প্রকোপ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত অভিনব সাশ্রয়ী পদ্ধতিও বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ খুব নিবিড়। অনুসন্ধানকারীরা রোগীর ডাক্তারী পরীক্ষা না করে বরং রোগীর তত্ত্বাবধানকারী এবং রোগীর কাছ থেকে রোগ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, খিঁচুনী এবং অচেতনতা, বিশেষ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য সাধারণ ব্যক্তিবর্গও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। অনুসন্ধানকারীরা লক্ষ্য করেছেন যে, ক্যাচমেন্ট এলাকায় সনাক্তকৃত রোগীদের মধ্য থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মৃতের হার এই গবেষণা চলাকালীন সময়ে সনাক্তকৃত হাসপাতালে ভর্তি না হওয়া রোগীদের তুলনায় ৮ গুণ বেশি ছিলো, এবং এর কারণ সম্ভবত বেশি মারাত্মক রোগীরাই হাসপাতালে ভর্তি ছিলো।

রাজশাহীর মতো উচ্চহারবিশিষ্ট জাপানিজ এনসেফালাইটিস-আক্রান্ত এলাকায় এই রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশের উচিত জীবাণুর বাহক মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা। জাপানিজ এনসেফালাইটিস সংক্রমণ বিস্তারে এর ধারক পশু এবং বাহক মশার ভূমিকা সম্পর্কে জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমান-অধ্যুসিত এই দেশে শুকরের সংখ্যা যদিও সীমিত, তবুও জাপানিজ এনসেফালাইটিসের সংক্রমণ বিস্তারে পরিবেশগত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লম্বা পা-ওয়ালা জলচর পাখি (ওয়েডিং বার্ড, যেমন- বক), বছরব্যাপী ধানের আবাদ, এবং সারা বছর দেশব্যাপী মশার উপদ্রব উলেখযোগ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। মশা-নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত পরিবর্তন ছাড়াও জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন প্রয়োগকে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন (১)। বাংলাদেশের মতো তাইওয়ান এবং নেপালেও জাপানিজ এনসেফালাইটিসের প্রকোপ একই ধরনের, এবং সেখানে এ-রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন প্রয়োগ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে (৩,৬,৭)। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগের প্রকোপ বেশি, বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে, সেখানে ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য এ-গবেষণা থেকে সুপারিশ করা হচ্ছে।

References

1. Lowry PW, Truong DH, Hinh LD, Ladinsky JL, Karabatsos N, Cropp CB *et al*. Japanese encephalitis among hospitalized pediatric and adult patients with acute encephalitis syndrome in Hanoi, Vietnam 1995. *Am J Trop Med Hyg* 1998;58:324-9.
2. Kari K, Liu W, Gautama K, Mammen MP, Jr., Clemens JD, Nisalak A *et al*. A hospital-based survellance for Japanese encephalitis in Bali, Indonesia. *BMC Medicine* 2006;4:8.
3. Wierzba TF, Ghimire P, Malla S, Banerjee MK, Shrestha S *et al*. Laboratory-based Japanese encephalitis surveillance in Nepal and the implications for a national immunization strategy. *Am J Trop Med Hyg 2008;*78:1002-6.
4. Khan AM, Khan AQ, Dobrzynski L, Joshi GP, Myat A. A Japanese encephalitis focus in Bangladesh. *J Trop Med Hyg* 2008;84:41-4.
5. 2006. Japanese encephalitis vaccines. *Wkly Epidemiol Rec* 81: 331-40.
6. Wu YC, Huang YS, Chien LJ, Lin TL, Yueh YY, Tseng WL *et al*. The epidemiology of Japanese encephalitis on Taiwan during 1966-1997. *Am J Trop Med Hyg* 1999;61:78-84.
7. Partridge J, Ghimire P, Sedai T, Bista MB, Banerjee M. Endemic Japanese encephalitis in the Kathmandu valley, Nepal. *Am J Trop Med Hyg* 2007;77:1146-9.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৮-ফেব্রুয়ারি ২০০৯

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=২৭৩)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা=৪৫৮)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২২.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৭৮.০	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫১.৬	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৬.৬	১.৩
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৭.৩	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২৮.২
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১.৭
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.২

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৮-ফেব্রুয়ারি ২০০৯

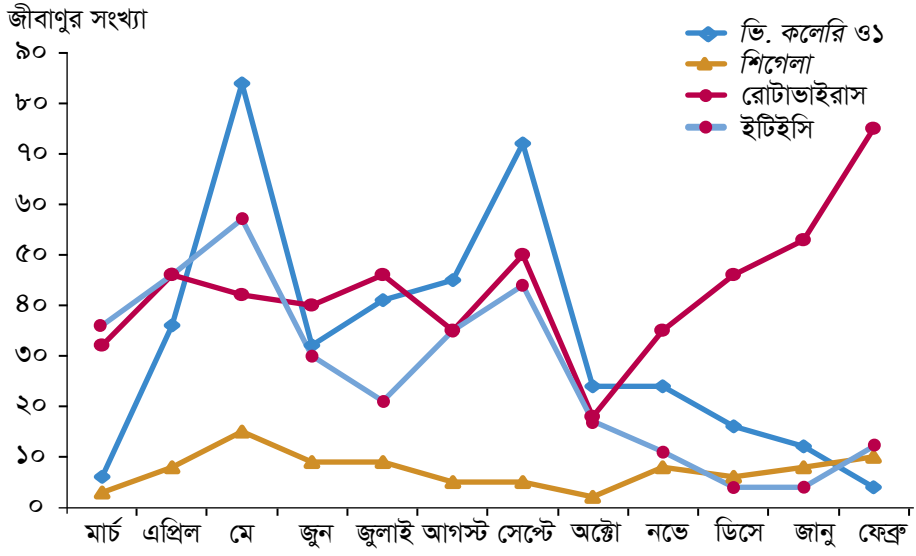

ওষুধের বিরুদ্ধে ৫০ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: ফেব্রুয়ারি ২০০৮-সেপ্টেম্বর ২০০৮

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট (সংখ্যা=৫০)
	প্রাথমিক (সংখ্যা=৪৬)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=৪)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	৮ (১৭.৪)	২ (৫০.০)	১০ (২০.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৩ (৬.৫)	১ (২৫.০)	৪ (৮.০)
ইথামবিউটাল	১ (২.২)	০ (০.০)	১ (২.০)
রিফামপিসিন	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
অন্যান্য ওষুধ	৯ (১৯.৬)	২ (৫০.০)	১১ (২২.০)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১০	১০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১০	৪ (৪০.০)	০ (০.০)	৬ (৬০.০)
ক্লোরামফেনিকল	১০	৯ (৯০.০)	০ (০.০)	১ (১০.০)
সেফট্রিআক্সোন	১০	১০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০	৯ (৯০.০)	০ (০.০)	১ (১০.০)
জেন্টামাইসিন	১০	৭ (৭০.০)	১ (১০.০)	২ (২০.০)
অক্সাসিলিন	১০	১০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ট হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা, শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) এবং মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৯৪	৩৫ (৩৭.০)	০ (০.০)	৫৯ (৬৩.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৯৪	৫৪ (৫৭.০)	০ (০.০)	৪০ (৪৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	৯৪	৫৪ (৫৮.০)	০ (০.০)	৩৯ (৪২.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৯৪	৯৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৪	৩৮ (৪০.০)	৪৯ (৫২.০)	৭ (৭.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৯৪	১ (১.০)	০ (০.০)	৯৩ (১০০.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ট হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা, শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) এবং মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা।

মাসভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার: মে ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০০৯

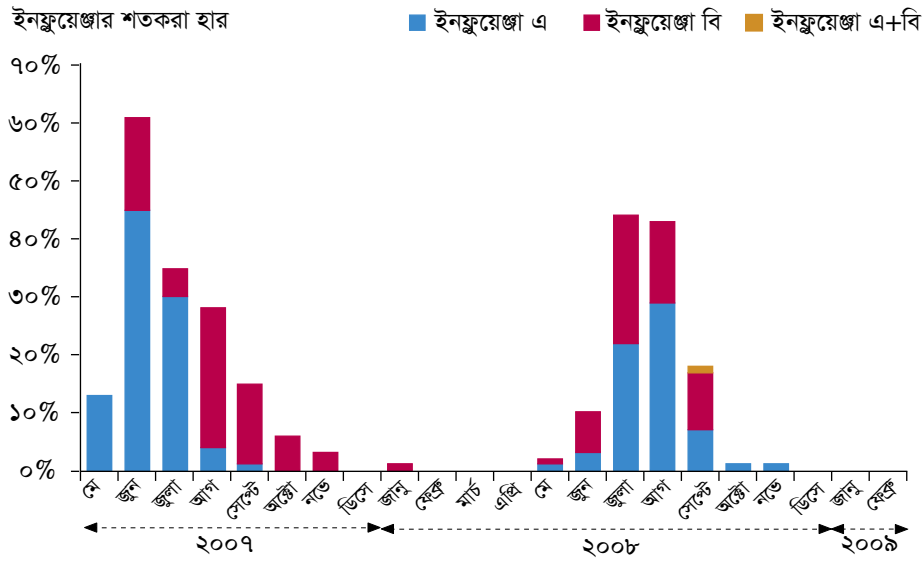

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিং), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

রিকেট-আক্রান্ত একটি শিশু

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), রাজকীয় নেদারল্যান্ডস-এর দূতাবাস (ইকেএন), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং সুইডিস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ (সিডা)। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমিলি গারলি
ডরোথি সাউদার্ন
এডোয়ার্ডো আজিজ-বামগার্টনার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
নুসরাত হোমায়রা
এস কে রয়
রিপন পাল

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যাবস্থাপনা এবং অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম